চরিত্রগুলির জীবনেরও অবসান। এই স্বল্প পরিসর ... শুধুমাত্র প্রকাশধর্মী। স্বাভাবিক। 'কৃষ্ণকুমারী'র চরিত্রগুলিও তাই বিকাশধর্মী নয়, শুধুমাত্র প্রকাশধর্মী।

কৃষ্ণকুমারী

'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের চরিত্রগুলির আলোচনায় প্রথমেই নায়িকাচরিত্র কৃষ্ণকুমারীকে গ্রহণ করা যায়। চরিত্রটি সম্পর্কে মধুসূদনের নিজের মন্তব্য ঃ "the princess, I hope, is dignified, yet gentle." সত্যসত্যই নাটকের মধ্যে কৃষ্ণকুমারী তার অপাপবিদ্ধ সারল্য এবং নবযৌবনের বর্ণালী স্বপ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কৃষ্ণকুমারীর এই সারল্য এবং স্বপ্নালু দৃষ্টি নাটকের কাহিনীর অনুসরণেই দেখা দিয়েছে। সে-কারণেই তাই চরিত্রটির স্বাভাবিকতা প্রশ্নাতীত। চরিত্রটির এই স্বাভাবিকত্ব এবং ঔচিত্যকে কাহিনীর সূত্রেই বিচার ক'রে দেখা যেতে পারে। কৃষ্ণকুমারী, মেবারের রাণা ভীমসিংহ এবং মহিষী অহল্যাদেবীর প্রাণাধিকা আদরের কন্যা। সুতরাং তার পক্ষে সংসারের তিক্ত কঠিন রূপটি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন একরূপ অসম্ভব। তদুপরি নাট্যমধ্যে কৃষ্ণকুমারীকে যে বয়সে দেখা যাচ্ছে, তাতে তার মনে জীবনের আশারঙীন ইশারা যে অহর্নিশি হাতছানি দেবে, এ-তো একান্ত স্বাভাবিক। নাটকের প্রারম্ভে কৃষ্ণকুমারী চরিত্রটি মঞ্চে উপস্থিত না থেকেই আমাদের মানসদৃষ্টিতে অতুলনীয় রূপরাশির বৈভব এবং অশেষ গুণরাজির মৃদু সৌরভ নিয়ে উপস্থিত হয়। এরপর তার সম্পর্কে জানা যায় যে, সঙ্গীত-শিক্ষা এবং উদ্যান-পরিচর্যার অবসরেই তার দিন কাটে। কিন্তু এই সুখরম্য পরিবেশ এবং মাতাপিতা ও পরিবার-পরিজনদের সস্নেহ আশ্রয়কক্ষ থেকে কৃষ্ণকুমারী মহাকালের নির্মম রথচক্রে নিক্ষিপ্ত এবং পিষ্ট হয়েছে নাট্য-কাহিনীর অনুসরণে। এর কারণ, এ-নাটক কৃষ্ণকুমারীরই ট্র্যাজেডি। এই ট্র্যাজেডির প্রথম পদসঞ্চার জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ কর্তৃক রাজকুমারী কৃষ্ণার রূপ-সৌন্দর্যের কথা শোনায়। তারপর নাটকের কাহিনী তাকে ঘিরেই আবর্তিত হ'তে আরম্ভ করেছে। কিন্তু সংসার অনভিজ্ঞা কৃষ্ণকুমারী সে-আবর্তনের কোন সংবাদই রাখে নি। অকস্মাৎ বাইরের ঘূর্ণি ঝড়ে পড়ে সে দিশাহারা হয়ে গেছে। রাজকুমারী কৃষ্ণা, মদনিকার কৌশলে মরুদেশের রাজা মানসিংহকে তার কুমারী মনের স্বপ্নরঙীন অনুরাগ নিবেদন করেছে। এই নবজাগ্রত প্রেমচেতনা কৃষ্ণকুমারী চরিত্রটিকে এক মুহূর্তেই বালিকা থেকে যুবতীতে পরিণত করেছে। মদনিকার সঙ্গে কথা বলার অব্যবহিত পরেই কৃষ্ণকুমারীর স্বগতোক্তি ঃ "কি আশ্চর্য! রাজা মানসিংহের কথা শুনে আমার মনটা যে এত চঞ্চল হলো, এর কারণ কি? (চিত্রপটের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) অ্যাঁ, এমন রূপ! আহা, কি অধর, কি হাস্য, এমন রূপবান পুরুষ কি পৃথিবীতে আছে? আ মরি মরি! ও দূতী যা বলেছিল, তা সত্য বটে। হায়! হায়! আমার অদৃষ্টে কি তা হবে? আমার মনটা যে অতি চঞ্চল হয়ে উঠলো। না, এখানে থাকা উচিত নয়, কে আবার এসে দেখবে, যাই, আপনার ঘরে যাই। সেখানে নির্জনে চিত্রপটখানি দেখি গে। আহা, কি চমৎকার!" এরপরই মদনিকার সাময়িক অদর্শনে ব্যাকুল কৃষ্ণকুমারী স্বগত উক্তি করেছে ঃ 'হারে অবোধ মন! কেন বৃথা এত চঞ্চল হোস? নিশার স্বপ্ন কি কখন সফল হয়? এ দূতীটি কি আমাকে ছলনা করে

Scanned with CamScanner

গেল?' এই কাতর চাঞ্চল্যের পরই তার মনে দেখা দিয়েছে প্রেমের বিরহ-দহন আর্তি "আহা! সে এক সময় আর এ এক সময়। আমি কেন বৃথা আবার এখানে এলেম? এ সকল কি আমার আর ভাল লাগে?" রাজকুমারী কৃষ্ণা এখন তার পুষ্পচর্চা এবং সঙ্গীতানুশীলন বিস্মৃত হয়েছে। এখন তার মনে অতনুর অরূপ কান্তির নিত্য যাওয়া আসা।

কিন্তু রাজকুমারী কৃষ্ণার জীবনে এই প্রেমস্বপ্নের সঞ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এসেছে রাজনীতির বিষাক্ত বর্ষণ। রুদ্র নিয়তি সরলা, নিরপরাধা, সংসার অনভিজ্ঞা কৃষ্ণকুমারীকে রাজপ্রাসাদের স্নেহ কোমল সুখশয্যা থেকে রাজনীতির স্বার্থসিদ্ধির কূটনৈতিক কৌশলের নগ্ন বাস্তবতার কঠিন ভূমিতে নিক্ষেপ করেছে। অশরীরী পদ্মিনীর দর্শন-লাভ তাকে এ-বিষয়ে সর্বপ্রথম সচকিত ক'রে তুলেছে, কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন ক'রে তুলতে পারে নি। সে চেতনা জেগেছে তার জীবনের শেষ রাত্রির অন্তিম প্রহরে। স্নেহশীল কাকা বলেন্দ্রসিংহের কাছে নিজ জীবননাশের কারণ শোনার পর তার জিজ্ঞাস্য ঃ "কাকা, আমার পিতারও কি এই ইচ্ছা যে"— এর উত্তরে পিতার ইচ্ছা শুনেই সে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়েছে। তার মত মনোবৃত্তিসম্পন্ন কন্যার পক্ষে কি নিজ প্রাণের বিনিময়ে পিতার রাজ্যবিনাশ সম্ভব? সুতরাং খুব স্বাভাবিকভাবেই কৃষ্ণকুমারী আত্ম-হননের দ্বারা পিতাকে বিপন্মুক্ত করতে চেয়েছে। পদ্মিনীর প্রেরণা তাকে এই কর্মে উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে সাহায্য করেছে মাত্র, পথ-প্রদর্শন করে নি। কারণ, রাজকুমারী কৃষ্ণার অন্তিম উক্তিতে যে তীব্র অভিমান পিতামাতার প্রতি প্রকাশিত হয়েছে, তাতে রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যুকে কখনোই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাজনিত মৃত্যু বলা যায় না। রাজকুমারীর মৃত্যুকে একান্ত পারিবারিক ঘটনারূপেই দেখা উচিত। মরণ কালে মাতার প্রতি কৃষ্ণকুমারীর উক্তি ঃ "মা! তোমার এ দুঃখিনী মেয়েকে এরপর এক একবার মনে করো (মৃত্যু)-।" নিঃসন্দেহে তার মনের অভিমানকেই প্রকাশ করে। কিন্তু এই অভিমান কার 'পরে? এ অভিমান তার পিতা এবং মাতার প্রতিই সে প্রকাশ করেছে। এ-দুজন ছাড়া অপর কোন তৃতীয় ব্যক্তিকে তার মনের অভিমান জানানো সম্ভব নয়। এই কারণেই কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যুকে পারিবারিক ঘটনা বলা যেতে পারে। আর তা ছাড়া রাজনৈতিক সংঘর্ষের কারণে রাজকুমারী কৃষ্ণার মৃত্যু ঘটলেও, সে নিজে এই রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে থাকে নি। মেবারের রাজকন্যারূপেই এই সংঘর্ষে তার স্থান। ফলে মেবারের রাণা ভীমসিংহের আদেশে তার আত্মহত্যা আসলে পিতার প্রতি অভিমানে স্নেহাতুরা সরলা কন্যার আত্মহত্যা।

কৃষ্ণকুমারী চরিত্রটি অঙ্কনে মধুসূদন সংস্কৃত সাহিত্যের নায়িকা চরিত্রের আদর্শই গ্রহণ করেছেন, একথা একরূপ সংশয়াতীতভাবেই বলা যেতে পারে। পূর্ববর্তী নাটকগুলির মত এ-নাটকেও সংস্কৃত নাটকের ছায়া পড়েছে চরিত্র চিত্রণে। কৃষ্ণকুমারী চরিত্রটি একদিকে সরলা এবং সংসার অনভিজ্ঞা। সঙ্গীত এবং উদ্যান চর্চাতেই তার দিন কাটে। তার এই রূপের সঙ্গে কালিদাসের শকুন্তলা চরিত্রটির তুলনা খুব সহজেই মনে আসে। বিশেষভাবে উদ্যানের বৃক্ষরাজির সঙ্গে কৃষ্ণকুমারীর সখিত্বের যে ইঙ্গিত মধুসূদন নাট্য-মধ্যে উপস্থিত করেছেন, তার মূলে রয়েছে কালিদাসের 'শকুন্তলার' প্রভাব। আশ্রম পরিত্যাগ কালে শকুন্তলা যেমন বনতোষিণীকে আদর-সম্ভাষণ জানিয়েছে, সেই রূপ আসন্ন মৃত্যুর পটভূমিকায় কৃষ্ণকুমারীও দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ ক'রে বলেছে, "আহা! আমি এই মল্লিকা ফুলটিকে আদর করে

Scanned with CamScanner

বনবিনোদনী নাম দিয়েছিলাম। এই সুচারু শমী-বৃক্ষটিকে সখী বলে বরণ করেছিলাম। (সচকিতে) ওকি! আহা! সখি তুমি কি এ হতভাগিনীর দুঃখ দেখে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়চো?" তবে আশ্রম প্রকৃতির সঙ্গে শকুন্তলার সম্পর্কের আলোয় কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গে উদ্যানের সম্পর্ককে বিচার করা চলে না। কারণ, শকুন্তলা আশ্রম প্রকৃতিরই অংশ; আর কৃষ্ণকুমারীর অবসরের বিলাস এই উদ্যান। তবে দুজনের মধ্যে সাদৃশ্যই এক্ষেত্রে আলোচ্য।

Scanned with CamScanner